এই সংখ্যায় ভিতরের পাতায়
√ রঙিন আকাশ √ প্রশ্নোত্তর
√ পৃথিবীর কবচ √ প্রতিবেদন
√ যারা হারিয়ে যাচ্ছে
√ মহাবিশ্বে মহাকর্ষ √ অ্যাজ ডেড অ্যাজ ডোডো

বিজ্ঞান অন্বেষক

বিজ্ঞান অন্বেষক এর গ্রাহক হোন। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা মাত্র ৬ টাকা। ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হবে। বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তুলতে আমাদের পাশে থাকুন।

বর্ষ -১ দ্বিতীয় সংখ্যা মার্চ - এপ্রিল /২০০৪ দাম ১ টাকা

পাখিদের কথা

কাঁথা জড়ানো শীতের বুড়ি বিদায় নিতে চলেছে কারণ তরুণ বসন্ত কাছে এল বলে। সূয্যি মামার তেজ বাড়ছে ক্রমশ। আস্তে আস্তে রাত ছোটো হয়ে দিন বড় হচ্ছে আর শীতঘুম কাটিয়ে একটু একটু করে প্রকৃতি চোখের পাতা মেলছে। এসময় শীত কম হওয়াতে লুকোনো গর্ত থেকে পোকামাকড় কীটপতঙ্গরা বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে আর এই সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা অনেক পাখিদের মধ্যে কচি বাঁশপাতা রঙের 'বাঁশপাতি পাখি'র নাম আগে করা যায়।

বাঁশপাতি : বাংলায় এরা বাঁশপাতি এবং ইংরাজিতে Small green bee eater নামে পরিচিত। এদের বিজ্ঞানসম্মত নাম *Merops orientalis*। আকারে চড়াই পাখির মতো ছিপছিপে রোগা এই পাখিগুলি ঘাস সবুজ বা কচি

এরপর ৩ পাতায়

অলৌকিক নয় বিজ্ঞান

কুকুর, সাপ, থালাপড়া

বিশ্বাস : কুকুর-বিড়াল-শিয়াল-নেকড়ে বা সাপ কামড়ালে থালাপড়ার মাধ্যমে বিষ নামানো যায়।

বিজ্ঞান : থালাপড়ার মাধ্যমে বিষ নামানো যায় না। কুকুরে কামড়ালে সাধারণত জলাতঙ্ক রোগ হয়। যে সমস্ত কুকুরের লালায় জলাতঙ্ক

এরপর ৬ পাতায়

ডাইনি প্রথা

একটি সামাজিক ব্যাধি

একুশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছেও আমরা এখনো আমাদের অতীতের কিছু বিশ্বাসকে ভুলতে পারিনি। প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নির্ণয়ে ব্যর্থ আদিম যুগের মানুষ সবকিছুর জন্য দায়ী করতো কোনও অতিপ্রাকৃত শক্তিকে। তারা মনে করতো শক্তি শুভ হতে পারে, অশুভও হতে পারে। শুভ শক্তি তাদের সমস্ত বিপদের হাত থেকে বাঁচায়। অশুভ শক্তি তাদের ক্ষতি করে। পরবর্তীকালে প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মানুষ জেনে গেলেও যুগ যুগ ধরে মনের মধ্যে গড়ে তোলা অশুভ শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে ভয় মানুষের মধ্যে কুসংস্কার হিসাবে থেকেই গেল। কিছুক্ষেত্রে গুটিকয় মানুষ অন্য মানুষদের সহজে দমিয়ে রাখার জন্য এই ভয়টাকে বা বিশ্বাসটাকে কাজে লাগাল। ওঝা, গুণীনদের ব্যবসার খাতিরে ভূত, প্রেত, অশুভ আত্মা, ডাইনি প্রভৃতি ধারণা আরও বেশি করে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনসমাজে টিকে থাকল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছোটদের এমনকি বড়দের লেখায় ডাইনি বা ডাকিনীদের কথা পাওয়া যায়। এদের সম্পর্কে ভালো কথা কমই লেখা থাকে। এদের অশুভ শক্তি হিসাবেই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখানো হয়। তাই তথাকথিত শিক্ষিত সমাজেও অনেক মানুষের মনে ছোটবেলার গল্প কথায় পড়া ডাইনির কার্যকলাপ, ডাইনি বা অশুভ শক্তির অস্তিত্ব সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস গড়ে তোলে। শিশুমনে রূপকথার গল্পের চরিত্ররা বিশ্বাসযোগ্য থাকে। শিশুদের মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব রয়েছে। কুসংস্কারপূর্ণ সমাজে যে শিশুরা বড় হয় তাদের মধ্যে অনেকের ক্ষেত্রেই কুসংস্কারগুলো আরও বেশি স্থায়ী হয়।

কুসংস্কার মেনে চলা মানুষকে খুব সহজেই প্রভাবিত করা যায়। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে যুগ যুগ ধরে কিছু মানুষ তাদের কাজ গুছিয়ে নিয়েছে। যেসব কুপ্রথাকে কিছু মানুষ (ওঝা, গুণীন, জানগুরু) তাদের কাজে লাগিয়েছে তারমধ্যে ডাইনি প্রথা অন্যতম। জোয়ান অব আর্ককে ডাইনি নাম দিয়ে পুড়িয়ে মেরেছিল কিছু মানুষ। জোয়ান অব আর্ক ইতিহাসে স্থান পেয়েছেন। কিন্তু সুখদা, আদুরি বা সাধন কিসকুর নাম কতজন জানেন? ডাইনি আখ্যা দিয়ে যাদের উপর শারীরিক নির্যাতন হয়েছে কেবলমাত্র তাদের কথাই খবরের কাগজে জানা যায়। কিন্তু অসংখ্য মানসিক নির্যাতনের ঘটনা গ্রামের ঘরবাড়ী, খোলা মাঠের মধ্যেই হারিয়ে যায়। তাদের কথা আমরা জানতেও পারি না।

এর পর ২ পাতায়

রামন প্রভাব

চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন। মাথায় পাগড়ি পরা সৌম্য, দীর্ঘকায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ একটি মূর্তি— আমাদের দেশের মাটিতেই যাঁর জন্ম। ভারতীয় বিজ্ঞানের উপকূলে তিনি এক লাইট হাউস, যাঁর দ্যুতি বহু বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

রামন পদার্থবিদ্। তিনি বলতেন, 'প্রকৃতির বর্ণনায় বিজ্ঞান মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ ও মননশক্তির সংযোজন। সৃজনধর্মী কলায় এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ।' পদার্থবিদ্যার নানান ভাগ থেকে গবেষণার জন্য তিনি যে বিষয়গুলি বেছে নিয়েছিলেন তা থেকেই তাঁর অভিমত বোঝা যায়। শব্দ ও বাদ্যযন্ত্র বিষয়ে কাজ শুরু করলেও,

এর পর ৪ পাতায়

বার্ড ফ্লু

'বার্ড ফ্লু' বা 'অ্যাভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা' পাখিদের একটি রোগ। যার কারণ অর্থোমিক্সো (Orthomyxo) জাতির ভাইরাস (৮০-১২০ মিমি পরিধি)। বহু প্রাচীন কাল থেকে এই রোগটি দেখা যায়। ১৯১৯ সালে স্পেন, ১৯৫৮ সালে চিন ও আমেরিকা, ১৯৬৯সালে হংকং ও আমেরিকাতে মানুষের মধ্যে এই রোগের প্রকোপ দেখা যায়। এই ভাইরাসের বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। টাইপ এ পাখি, শুকর,

এরপর ৩ এর পাতায়

সামাজিক ব্যাধি

১ পাতার পর

আমাদের দেশে বিশেষ করে আদিবাসী সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে ডাইনি সংক্রান্ত কুসংস্কারটি গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। আদিবাসীদের সমাজজীবনে বাইরে থেকে হস্তক্ষেপ করা হবে বলে অনেকেই এদের মন থেকে এই কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করে না। ফলে তাদের মনের মধ্যে ডাইনি আরও গভীরভাবে স্থায়ী হয়। আর এদের এই অন্ধবিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে জানগুরু, গুণীন, সকা বা সখারা তাদের রোজগার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে চলে— অসহায়, নিরীহ, কোনও বৃদ্ধা, বা মহিলাকে ডাইনি আখ্যা দিয়ে। পরিণতিতে সেই মহিলার মৃত্যু ঘটে উন্মত্ত মানুষের হাতে। কখনো কখনো সম্পত্তি বা টাকা পয়সার জন্য পরিবারের নিকট আত্মীয়রা জানগুরুর সঙ্গে পরামর্শ করে কাউকে ডাইনি চিহ্নিত করে। এক্ষেত্রেও জানগুরু বা অন্য গণনাকারী কিছু অং বং চং মন্ত্র পড়ে বা হাতের কারসাজী দেখিয়ে তার সামনে জড়ো হওয়া মানুষদের প্রভাবিত করে ডাইনির মৃত্যুদণ্ড বা জরিমানা ঘোষণা করে। অনেকক্ষেত্রেই জরিমানা আদায় চলতে থাকে আজীবন। ঠিক যেভাবে জরিমানা আদায় করা হয়েছিল পুরুলিয়ার টিপুড়ি গ্রামের সুরজমনি মাণ্ডির কাছ থেকে। সুরজমনিকে ডাইনি চিহ্নিত করে তার কাছ থেকে প্রথমে ৪৬৫২ টাকা তার পরে ৯১৪৪ টাকা, আতপ চাল, ৫টা মুরগি, ১টা ছাগল, ১টা শুয়োর, পরে আবার ৬৪০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছিল। এরপরে সুরজমনি রুখে দাঁড়ায়। এইভাবে জরিমানা আদায়ের ফলে একসময় অর্থের অভাবে এবং সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন থেকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত অসহায় মানুষটির মৃত্যু ঘটে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় অসহায় মহিলাদের। তবে কখনো কখনো পুরুষদেরও ডাইনি আখ্যা দেওয়া হয়।

শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে ডাইনি হত্যার ঘটনা বেশি ঘটে। এর অন্যতম কারণ নিরক্ষরতা, দারিদ্র। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে, যেখানে অন্ধবিশ্বাস জোরালোভাবে টিকে আছে সেখানে কারুর অসুখ বিসুখ হলে সাধারণ জড়িবুটি, টোটকা চিকিৎসাতেও যখন সারে না, তখন ডাইনির মতো কোন ধারণা মাথায় আসে। হাসপাতাল হয়ত বহু দূরে, সহজে যাওয়া যায় না, বা গেলেও জোটে উপেক্ষা বা দায়সারা চিকিৎসা। কোন রোগের উপশম হলেও অপুষ্টির জন্য বা পরিচ্ছন্নতার অভাবে রোগটি ঘুরে ফিরে আসে। ফলে বাড়তে থাকে জড়িবুটি, মন্ত্র, বাণমারা ইত্যাদির উপর বিশ্বাস এবং রোগের কারণ হিসাবে ডাইনির কার্যকলাপে বিশ্বাস। রোগ দূর করার জন্য মানুষ তখন হত্যা করে আরেকজন মানুষকে। এরজন্য হত্যাকারী অনুতপ্ত হয় না। কারণ তার বিশ্বাস সে কোনও মানুষকে মারছে না, মারছে অশুভ শক্তিকে—ডাইনিকে। এই অন্ধবিশ্বাস কতটা দৃঢ়মূল হতে পারে তার প্রমাণ নিচের ঘটনা :

মালদা জেলার গাজোলের একটি আদিবাসী গ্রামের ঘটনা। ওই গ্রামের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি মণ্ডল হাঁসদার বৌ বুকের রোগের ভুগছিলেন। তাঁকে ভর্তি করা হল গাজোল হাসপাতালে। কিন্তু মণ্ডলের বাবা যোগাযোগ করেছেন পাশের গ্রামের জানগুরুর কাছে। জানগুরুর গণনায় সাধন কিস্কু, বাঙ্গি হেমব্রম আর মাজাই সোরেন ডাইনি চিহ্নিত হলেন। পরদিন ভোরবেলা মণ্ডলের বাবা ও কিছু গ্রামবাসী ঘরের দরজা ভেঙে ঘুম থেকে তুলে ৫০ বছর বয়স্কা সাধন কিস্কুকে ও ৫৫ বছরের মাজাই সোরেনকে প্রচণ্ড পিটিয়ে মেরে ফেলে। আর বাঙ্গী সোরেনের ছেলে ধমর ডাইনি মারার আনন্দে লোহার রড লাল টকটকে গরম করে ঢুকিয়ে দেয় মায়ের বুকে।

সমাজের বুক থেকে এই কুপ্রথাকে দূর করার লক্ষ্যে আইন-কানুন কড়া হয়েছে। তবে অনেকসময় এই আইন প্রয়োগে প্রশাসনের তরফে গড়িমসি দেখা যায়। আইন প্রয়োগ করলে জনরোষ সৃষ্টি হয়। তাই আইনের পাশাপাশি দরকার এই বিষয়ে গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালানো। ডাইনি বলে কিছু হয় না, কিছু নেই, একথা প্রচার করার সাথে সাথে রোগ ব্যাধির কারণ জানানো দরকার। নিজের অন্তর থেকে কেউ যদি অন্ধবিশ্বাস দূর করতে না পারে তবে এই সামাজিক ব্যাধির স্থায়ী সমাধান হবে না।

—নিজস্ব প্রতিবেদন

ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে সরব বিজ্ঞান দরবার

নদিয়ার হরিণঘাটা ব্লকের দত্তপাড়ার বাসিন্দা ৬০ বছরের বৃদ্ধা বিমলা দাসি রায়কে গত ২৬ ফেব্রুয়ারি বুধবার 'ডাইনি' অপবাদ দিয়ে প্রকাশ্যে মারধোর করা হয়। জানা গেছে, দত্তপাড়া গ্রামের বাসুদেব সর্দার, ঝন্টু সর্দার, রামচরণ সর্দার ডাইনি অপবাদে বিমলা দাসি রায়কে মারধোর করেন। প্রাণকৃষ্ণ মণ্ডল ও মদন মণ্ডলের উদ্যোগে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা অসুস্থ বিমলাদেবীকে হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এক অসুস্থ ছেলের চিকিৎসার জন্য সরস্বতী বিশ্বাস বিমলা দাসির কাছে রোগ সারানোর জন্য গিয়েছিলেন। বিমলা দাসি রোগ সারাতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন। পরে গ্রামের ওঝা নিহারণ বিবির কাছে অসুস্থ ছেলেকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। নিহারণ বিবি জানান, বিমলাদাসি 'ভূত' হয়ে ছেলের ঘাড়ে চেপে রয়েছেন। নিহারণ বিবির কথায় বিমলাদাসিকে ডাইন সন্দেহে মারধোর করা হয়েছে। পুলিশ সর্দার পরিবারের তিনজনকে ও নিহারণ বিবিকে গেপ্তার করে ও পরে কল্যাণী মহকুমা আদালত অভিযুক্তদের জামিন দিয়েছেন।

পরের দিন ২৭ ফেব্রুয়ারি কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের এক প্রতিনিধি দল 'ডাইনি'র ঘটনাটি নিয়ে অনুসন্ধান শুরু করেন ও পাশাপাশি ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সামিল হন। বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি হরিণঘাটা থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। বিমলাদাসি রায়ের জীবনের নিরাপত্তার দায়িত্ব ও পাশাপাশি আইনানুযায়ী (দি ড্রাগ এ্যান্ড ম্যাজিক রিমেডিস্ (অবজেক্শন্যাবল অ্যাডভারটাইজমেন্ট) অ্যাক্ট-১৯৫৪) সমস্ত অপরাধীদের শাস্তির দাবী করা হয়। স্মারকলিপির একটি কপি স্থানীয় বিডিওকে জমা দেওয়া হয়।

এরপর ৪ পাতায়

মুখস্ত বিদ্যা নয়। পরীক্ষা হলে ইংরাজী বানিয়ে লিখে ভাল ফল করুন।
ভর্তি চলিতেছে—IX - XII & Degree.
যোগাযোগ - T. PAUL
বিবেকানন্দ পল্লী, নবনগর, হালিশহর ও রুচিরা হোটেলের পাশে, থানা মোড়, কাঁচরাপাড়া। ফোন: ৯৮৩১৪২২৭১৯

✆ ২৫৮৫-০৬৩৯
যে কোন অনুষ্ঠানের ভিডিও ও স্টিল ছবির জন্য আসুন—
স্টুডিও ইউনিক
কে.জি.আর.পথ, কাঁচরাপাড়া
(লক্ষ্মী সিনেমা, এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে)

বার্ড ফ্লু

১ পাতার পর

মানুষ, ঘোড়া ও জলচর পাখিকে আক্রমণ করে। টাইপ বি সীল ও টাইপ সি শুকরকে আক্রমণ করে। এই ভাইরাসের আবরণে দুধরনের প্রোটীন পাওয়া যায় যথা Haemaglutinin ও Neuraminidose। তার ওপর ভিত্তি করে এদের প্রকারভেদ যথাক্রমে 'H1 থেকে 15' ও 'N1 থেকে 9'। যেসব ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পাওয়া গেছে তাদের H1N1, H1N2, H2N1 ইত্যাদি প্রকারে চিহ্নিত করা হয়। সবচেয়ে মারাত্মক প্রকার হল H5N1। এই ভাইরাসটি প্রধানতঃ মানুষ থেকে মানুষ, শুকর থেকে মানুষে সংক্রামিত হত। বর্তমানে মুরগি থেকে মানুষে সংক্রামিত রোগটি সবার চিন্তার বিষয় হয়েছে। কারণ এরা খুব দ্রুত চরিত্র পাল্টে (অ্যান্টিজিনিক রিকমকমবিনেশন, সিফ্‌ট, ড্রিফ্‌ট প্রভৃতি পদ্ধতিতে) মারাত্মক লক্ষণ প্রকাশ করছে।

পাখির ক্ষেত্রে এই রোগটি শ্বাসতন্ত্র ও পরিপাকতন্ত্র দুটোকেই আক্রমণ করে। মানুষের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শ্বাসতন্ত্র আক্রান্ত হয় (বায়ু বাহিত শ্বাস কণা মাধ্যমে)। মানুষের জন্য এই রোগের টীকা ও চিকিৎসা আছে। ভাইরাসটি সাধারণ পদ্ধতিতে ফর্মালিন, ইথার, ডিটারজেন্ট ও অম্ল মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায়।

ভারতবর্ষে তথা পঃ বঙ্গে এই রোগটির কোনও মারাত্মক ভয় নেই। তবু আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে মুরগির মাংস ও ডিম ১০০° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ১০ মিনিট ধরে রান্না করে খেলে তা নিরাপদ। ভোপালে এই ব্যাপারে রোগ নির্ণয় কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

—ডাঃ গৌরাঙ্গ বর্দ্ধন (প্রাণী চিকিৎসক)

প্রতিবেদন

◆ বিজ্ঞান দরবার আয়োজিত বিজ্ঞানী গোপাল চন্দ্র বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর ১৮তম বর্ষের চূড়ান্ত পর্যায়ের অনুষ্ঠান ১৬/০২/২০০৪ কাঁচরাপাড়া কাজী নজরুল ইসলাম মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। চূড়ান্ত পর্যায়ে মদনপুর, কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া, হালিশহর, হরিণঘাটার ৪২টি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা বিজ্ঞান উপদেষ্টা ডঃ পূণ্যব্রত হাজরা।

◆ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ২৮-২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০০৪ বিধাননগর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনিক্যাল টিচার্স ট্রেনিং এন্ড রিসার্চ ও বিধাননগর গভঃ কলেজে অনুষ্ঠিত একাদশ রাজ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কংগ্রেসে ২০৩টি গবেষণা পত্র পাঠ করা হয়। বিজ্ঞান দরবারের কর্মী পান্নালাল মনি এককভাবে এবং পম্পা দাস ও সুরজিৎ দাস যৌথভাবে যথাক্রমে 'বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মসূচী' এবং 'নোনাঘাটা অঞ্চলের আর্সেনিক দূষণ' শীর্ষক গবেষণা পত্র পাঠ করেন। এই কংগ্রেসে ক্যানিং যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার জাহানারা খান, বিজন ভট্টাচার্য এবং নিরঞ্জন সর্দার প্রমুখ 'সর্পাঘাতে মৃত্যু প্রতিরোধে নতুন দিশার হদিশ' শীর্ষক গবেষণা পত্র পাঠ করেন। ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থার সম্পাদক পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পাখিরা হারিয়ে যাচ্ছে, বিকল্প কোন পথে' শীর্ষক মূল্যবান গবেষণা পত্র পাঠ করেন।

পাখি : বাঁশপাতি

১ পাতার পর

বাঁশপাতা রঙের। কালো ঠোঁটটি সরু লম্বা, অল্প বাঁকানো। ঠোঁট থেকে শুরু করে চোখের ওপড় পর্যন্ত একটি মোটা কালো দাগ দেখা যায়। চোখের রঙ উজ্জ্বল কমলা। গলা ঘিরে সরু কালো রেখা লক্ষ্য করা যায় এবং লেজের শেষে মাঝামাঝি জায়গা থেকে সরু কাঠির মতো এক পালকের বাহার এই পাখির প্রধান বৈশিষ্ট্য। গ্রামগঞ্জ-শহরাঞ্চলে টেলিগ্রাফ বা ইলেকট্রিক তারে, বাঁশগাছের সরু মগডালের কঞ্চিতে এবং নদী, জলাশয়ের ধারে বা খোলা গরু চরা মাঠের পাশের পাতাহীন সরু গাছের ডালে এদের সার বেঁধে বসা ও ওড়াউড়ি লক্ষ্য করা যায়। ডানাওয়ালা কীটপতঙ্গ উড়তে দেখলেই সাবলীল ভঙ্গিতে ছোঁ-মেরে পোকা শিকার করে পূর্বের জায়গাতেই ফিরে এসে বসে এবং সেখানেই শিকারকে ঠোঁটে করে আছড়ে মেরে গিলে নেয়। ডানা মেললেই এরা ট্রি-ট্রি-ট্রি স্বরে ডাকতে

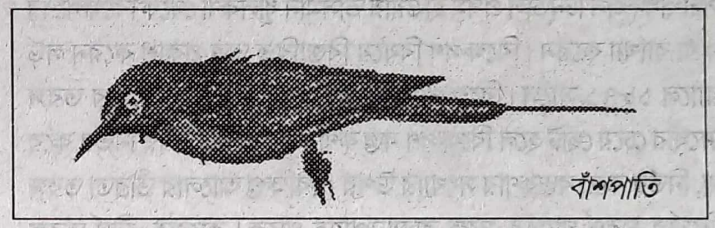

বাঁশপাতি

থাকে। সূর্য পশ্চিমপাটে গেলে এরা দু-তিনটিতে বা এককাঁকে গাছের দোল্ খাওয়া মগডালে বসে একসঙ্গে 'সন্তর' বাজনার মত মিষ্টি স্বরে ট্রি-ট্রি-ট্রি করে ডাকাডাকি করতে থাকে এবং নিজেদের মধ্যে এলোমেলো ওড়াউড়ি খেলা খেলে। রাতে একটি সরু ডালে অনেকগুলি বাঁশপাতি গায়ে গায়ে ঠেস দিয়ে নিজেদের ফোলানো ডানার পালকের মধ্যে ঠোঁট-চোখ গুজে ঘুমায়। অন্যান্য পাখিদের মতো ভোরবেলা ওঠার পাত্র এরা নয়। সূর্যের আলো ফোটার বেশ কিছু সময় পর এদের আধোঘুম ভাঙে। শীতের শেষে মথ, প্রজাপতি, মৌমাছি, বোলতা, ভীমরুল, ঘাসফড়িং, জলফড়িং, ডানাওয়ালা পিঁপড়ে ইত্যাদি কীটপতঙ্গর এত আধিক্য দেখা যায় যে বাঁশপাতি পাখি বাসা বানাবার ফয়সালা করে নেয় এবং সেইমতো এরা জলাশয়-পুকুর-বিল-নদী তীরবর্তী ঢালু পাড়ে প্রায় এক মিটার লম্বা সুড়ঙ্গ তৈরি করে বাসা বানায়। স্ত্রী পাখি এই বাসাতে কম বেশি ৬টি গোলাকার সাদা ডিম পাড়ে এবং স্ত্রী-পুরুষ উভয় পাখিই ডিমে তা দেয়। সবুজ বাঁশপাতির মতো আরো দুধরণের (মতভেদে) বাঁশপাতি পশ্চিমবঙ্গে গ্রাম-শহরে দেখা যায়। প্রথমটি নীলপুচ্ছ বাঁশপাতি (Blue tailed Bee eatger); বিজ্ঞানসম্মত নাম *Merops philippinus*। এদের লেজ নীলরঙের এবং দেহ বুলবুলি আকারের। অন্যটির নাম লালমাথা বাঁশপাতি (Chestnut headed Bee eater); বিজ্ঞানসম্মত নাম *Merops leschenqulti*। লেজের গোড়ার দিকে উপরের রঙ আকাশি নীল এবং লেজ থেকে কোনও সরু কাঠির মত পালক বেরোয়নি। মাথা থেকে পিঠ গাঢ় বাদামী, গাল হলুদরঙা। এদের স্বভাব, শিকার পদ্ধতি Small green Bee eater এর মতই, স্থানভেদে পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র এদের দেখা মেলে এবং সুন্দর তরতাজা তারুণ্যের প্রতীক সবুজের কথা বারবার এরা মনে করায়। এই পাখিটি ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে ক্ষেতের, ফসলের এবং গাছের উপকার করে।

—পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিবেণী যুক্তিবাদী সংস্থা

রামন প্রভাব

১ পাতার পর

গবেষণা জীবনের অধিকাংশ সময় কাজ করেন আলো আর দৃষ্টি নিয়ে, একসময় চুম্বকত্ব ও চুম্বকীয় আলোকতত্ত্ব নিয়েও কাজ করেন। শেষ জীবনে তিনি মণি, জহরত ও কেলাসের ধর্ম নিয়ে কাজ করেন। তাঁর এই বৈচিত্র্যময় গবেষণা জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যা কালের প্রভাবে কখনোই ম্লান হবার নয়, তা নিয়েই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক।

সি. ভি. রামন নামাঙ্কিত প্রভাব (রামন প্রভাব) : আলোর রশ্মি কোনও কণা, অণু বা পরমাণুর উপর এসে পড়লে সেটি শোষিত হবে অথবা গতিপথ থেকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে বিচ্যুত হবে। রশ্মির যে অংশ আপতিত রশ্মির গতিপথের দিকে না গিয়ে অন্য দিকে বিচ্যুত হয় তাকে বলা হয় বিক্ষিপ্ত রশ্মি। ঘটনাটা 'বিক্ষেপণ' (Scattering)। ১৮৬৯ সালে ব্রিটিশ পদার্থবিদ্ জন টিন্ডাল প্রথম হাওয়ায় ভাসমান ধূলিকণা থেকে বিক্ষেপণের কথা ব্যাখ্যা করেন। বিক্ষেপণ বিষয়ে বিস্তারিত তত্ত্ব প্রকাশ করেন লর্ড র‍্যালে ১৮৭১ সালে। বিক্ষেপণকারী বস্তুকণার আকার আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চেয়ে ছোট হলে বিক্ষেপণ বস্তু কণার আকারের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে বস্তুকণার সংখ্যার উপর। বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতে থাকে। কাজেই দীর্ঘ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো বেশি পরিমাণে বিক্ষিপ্ত হবে। সাত বর্ণের আলো মিলে তৈরি হয় সাদা আলো। সাদা আলো গঠনকারী ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিক্ষেপণ ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় হয়। সাদা আলোর বর্ণালীতে নীল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৪০০ অ্যাংস্ট্রম এবং লাল আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় ৬৬০০ অ্যাংস্ট্রম। (এক সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের দশ কোটি ভাগের একভাগ হল এক অ্যাংস্ট্রম) হিসাবে দেখা যায়, নীল আলো লাল আলো থেকে প্রায় পাঁচগুণ বেশি বিক্ষিপ্ত হয়। সাদা আলো মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যাবার সময় তার হলদে ও লাল অংশ মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সোজা চলে যাবে, তার অল্পই বিক্ষিপ্ত হবে। কিন্তু নীল অংশ ধারের দিকে বিক্ষিপ্ত হবে। এই প্রভাবের নাম হয়েছে 'টিনডাল প্রভাব'। ধূলি শূন্য গ্যাস থেকেও আলোর বিক্ষেপণ হয়। ক্যাবান্নেস ১৯১৪ সালে এটা প্রমাণ করে দেখান। টিনডাল-র‍্যালে প্রভাবে বিক্ষিপ্ত আলোর তীব্রতা কিন্তু অতি অল্প, মূল রশ্মির তীব্রতার এক হাজার ভাগের এক ভাগ। শক্তি ও ভরবেগের নিত্যতা অনুযায়ী এমনটিই হওয়া উচিত। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মনে সন্দেহ জাগল। মাধ্যমের অণুগুলির নিজস্ব অন্তর্দ্ধৃত শক্তির (Inherent Energy) কি কোনও ভূমিকা নেই? বিভিন্ন কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় বস্তুতে বিক্ষেপণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতে লাগল। সূক্ষ্ম পরীক্ষায় দেখা গেল টিনডাল প্রভাবে সূত্র অনুযায়ী যে ফলাফল পাওয়া উচিত বিক্ষিপ্ত আলোর অনেক ক্ষেত্রেই তার সঙ্গে মিল নেই।

বিক্ষিপ্ত আলোর প্রকৃতি নির্ণয়ে শুরু হল গবেষণা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার। এই অনুসন্ধানে যারা সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছিলেন রামন তাঁদের অন্যতম। অণুদের প্রতিসাম্যে (Symmetery) যে অসঙ্গতি দেখা যায় রামন তার ব্যাখ্যা খুঁজতে শুরু করলেন। বিক্ষেপণ নিয়ে তাঁর এই গবেষণায় ১৯২৮ সালে রামন এক চমকপ্রদ আবিষ্কার করেন। বিক্ষিপ্ত আলোর মধ্যে যে মুখ্য আলো থেকে বিক্ষেপণ তাতো থাকবেই আর সেই সঙ্গে ভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলোও থাকবে যা মুখ্য আলোয় ছিল না।

এই নতুন রশ্মির ধর্ম আরও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানতে হবে। শক্তিশালী মার্কারী ল্যাম্প থেকে যে মুখ্য আলো নির্গত হয় তার সামনে ফিল্টার দিয়ে মুখ্য আলোকে একবর্ণী (Monochromatic) করা হল। সেই আলো মাধ্যমে পড়ে যে বিক্ষেপণ করে তাও বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিশ্লেষণ করা হল। বর্ণালী চিত্রে প্রত্যেকটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা কম্পাংকের জন্য একটি করে রেখা পড়ে। এতে রামন দেখতে পান যে মার্কারীর জন্য নির্দিষ্ট রেখা ছাড়াও আরও কয়েকটি স্পষ্ট রেখা বর্ণালীতে রয়েছে। এই রেখাগুলি মূল রেখার দুদিকেই বিদ্যমান। অন্য একটি মার্কারি রেখা ব্যবহার করে দেখা গেল যে তার দুদিকে বর্ণালী রেখা থাকছে। তারপর মুখ্য আলো সরিয়ে নিলে নতুন বর্ণালী বিন্যাস এমন হয় যে মূল রেখা ও নতুন রেখাদের মধ্যে কম্পাঙ্ক ব্যবধান সমান থাকে। এই বাড়তি রেখাগুলির নাম হল 'রামন রেখা' (Raman Lines)। রামন বহু সংখ্যক বস্তু মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন। আবিষ্কারকের নামের সঙ্গে মিলিয়ে এই ঘটনাকে বলা হয়েছে 'রামন প্রভাব' (Raman Effect)। ১৯২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি রামন তাঁর আবিষ্কারের কথা জনসাধারণের কাছে ঘোষণা করেন। ১৯৩০ সালে রামন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

কার্যক্ষেত্রে রামন প্রভাবের ব্যবহার অত্যন্ত ব্যাপক। বস্তুর রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে রামন প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এনে দিয়েছে। অণুর গঠন জানার জন্য রামন রেখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন পদার্থের আণবিক প্রকৃতি আর স্ফটিক বিজ্ঞানের আন্তঃআণবিক বন্ধনী শক্তি নির্ণয়ে রামন প্রভাবের ভূমিকা অসাধারণ। জৈব রসায়নে অবিশুদ্ধি নির্ধারণে, কোনও যৌগে উপস্থিত মৌলিক পদার্থগুলোর অনুপাত নির্ণয়ে রামন প্রভাবকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এছাড়া পরমাণু কেন্দ্রীয়ের আবর্তন, আইসোটপী ঘূর্ণন প্রভৃতি ব্যাপারে রামনের আবিষ্কারকে কাজে লাগানো হচ্ছে। কেলাসে আলোক বিক্ষেপণ নিয়ে রামনের গবেষণা খুবই উন্নত মানের মৌলিক জ্ঞানের দরজা খুলে দিয়েছে।

—গোবিন্দ দাস (ফোন : ০৩৩- ২৫৮৯১৫১২)

সরব বিজ্ঞান দরবার

২ পাতার পর

আসল ঘটনা : বিমলাদাসি রায়ের স্বামী দেবেন রায় পেশায় ছিলেন চাঁদসীর চিকিৎসক। স্বামী মারা যাওয়ার পর তিনি সম্পত্তি বিক্রি করে নোনাঘাটার পাশের গ্রামে দত্তপাড়ায় বসবাস করতেন। বর্তমানে ব্যাঙ্কে বিমলাদেবীর প্রায় পাঁচ হাজার টাকা জমা রয়েছে। এই টাকা আত্মসাৎ করার জন্য তাকে ডাইনি আখ্যা দেওয়া হয়। নোনাঘাটা ও দত্তপাড়া অঞ্চলে বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞানদরবারের কর্মীরা গ্রুপ মিটিং করে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে 'ডাইনি' বলে কিছু নেই। গ্রামের কিছু ওঝা গুনিনদের যোগসাজসেই 'ডাইনি' সন্দেহে অত্যাচার করা হয়। প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্যা বাসন্তী গোলদার সহ বহু মহিলাই 'ডাইনি' প্রথার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানদরবারের সঙ্গে প্রতিবাদে সামিল হন। বিজ্ঞান দরবারের পক্ষ থেকে ডাইনি সহ বিভিন্ন কুসংস্কারগুলির বিরুদ্ধে প্রচার চালানোর পাশাপাশি জানানো হয় রোগ সারানোর জন্য ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

রঙীন আকাশ

আজকাল প্রায়ই একটা শব্দগুচ্ছ শোনা যাচ্ছে: ওয়েভ লেন্থ ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং বা WDM। বিশেষত টেলিফোনের কাজে WDM তো আজকাল হরদম উচ্চারিত হচ্ছে। ব্যাপারটি কি জানতে চেয়েছিলাম একজন অধ্যাপকের কাছে। তিনি আমাকে বহু কথা বলেছিলেন। তাঁর কথার প্রায় নব্বই শতাংশ ডান কান দিয়ে ঢুকে বাঁ কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে। যেটুকু মর্মে প্রবেশ করেছিল সেটাই বলবার চেষ্টা করছি।

এককালে ছিল, এখনও আছে, ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং। একটা চ্যানেল দিয়ে একাধিক উৎসের খবর একই সময়ে পাঠানো হয়। পরে সেগুলোকে আলাদা করা হয়। ফ্রিকোয়েন্সি আলাদা বলে ভাগ করে নিতে কোনও অসুবিধে হয় না। এটা খানিকটা এই রকম ব্যাপার :

রাম বড় জাগুলি থেকে সাড়ে আটটায় এল নৈহাটি স্টেশনে। শ্যাম কাঁচরাপাড়া থেকে ঐ সময়েই এল। যদু বাগমোড় থেকে হাজির হল একই সময়ে। যদুর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণী থেকে চলে এল মধু। চার জনেই নৈহাটি লোকালে চেপে সাড়ে নটা নাগাদ শিয়ালদা পৌঁছল। তরপরে রাম ট্যাক্সি নিয়ে চলে গেল হাওড়া। শ্যাম বজবজ লোকালে উঠে মাঝেরহাট আর যদু বারুইপুরের ট্রেনে চেপে গড়িয়া রওনা হল। মধু পা-গাড়ী চালিয়ে চাঁদনিচক মুখো হল। ফ্রিকোয়েন্সি ডিভিশন মাল্টিপ্লেক্সিং হচ্ছে ঠিক এইরকম। এবার ধরা যাক, এই চার জনের জন্য চার পত্রবন্ধু শিয়ালদায় অপেক্ষা করছে। পত্রবন্ধুরা তাদের ট্রেনের যাত্রী বন্ধুদের ঠিক ঠিক চিনবে কেমন করে? তারা তো কখনও পত্রবন্ধুদের দেখেনি। এমনকি রামদের ছবিও তাদের কাছে নেই। তবুও রামের পত্রবন্ধু কামাল, শ্যামের পত্রবন্ধু হেনরি, যদুর পত্রবন্ধু বলু আর মধুর পত্রবন্ধু কিশোর তাদের ঠিক ঠিক চিনে নিয়েছিল।

আসলে রাম, শ্যাম, যদু, মধুরা বন্ধুদের তাদের জামার রঙ আগেই জানিয়ে দিয়েছিল। রামের ছিল লাল জামা, শ্যামের নীল জ্যাকেট, যদুর ছাই রঙের সাফারি আর মধুর গায়ে ছিল কচি কলাপাতা রঙের গেঞ্জি। শিয়ালদা স্টেশনের মুখে কামাল খুঁজছিল লাল রঙ, হেনরি নীল, বলু ছাই রঙ আর কিশোরের চোখ অনুসন্ধান করছিল কচি কলাপাতার আভা।

সূর্যের আলো সাদা। কিন্তু তার মধ্যে সাত রঙ মিশে থাকে। প্রিজমে ফেলেই বেনিয়াসহকলা (VIBGYOR) আঁচ করা যায়। WDM-এ এই সুযোগটাই গ্রহণ করা হয়েছে। এক একটা উৎসকে এক এক রঙে রাঙিয়ে দিয়ে দোল খেলতে পাঠানো হয়। অর্থাৎ সব রঙ একাকার হয়ে একসঙ্গে জয়যাত্রায় রওনা হয়। সব রঙ মিলে মিশে সাদা হয়ে এগিয়ে যায় গন্তব্যের দিকে। সেখানে যার যেটা প্রয়োজন সেই রঙ সে আলাদা করে বেছে নেয়। কামাল, হেনরি, বলু আর কিশোরের মত। তারপরে ওই রঙ থেকে আসল মানুষ, থুড়ি তথ্য বার করে নেওয়া হয়।

এই দোল খেলাতেই মেতে উঠেছে আধুনিক তথ্য বিনিময় প্রযুক্তি। তথ্যের নানা উৎস থেকে উন্নত প্রযুক্তির পিচকিরির মাধ্যমে ছিটকে আসছে নানা রঙ। সেই রঙই পায়রার মত গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দিচ্ছে—আমার কামনা, আপনার বাসনা, রামা মুচি, হাসিম শেখের বেদনা আর টম, ডিক, হ্যারির আকাঙ্খা। তাই আকাশ এখন পরিষ্কার, অথচ রঙীন।

—তরুণ কুমার দে

পৃথিবীর কবচ

সৌরজগৎ সৃষ্টি হওয়ার সময় আমাদের এই পৃথিবীকে প্রকৃতি একটি কবচ দিয়েছে, তা হল চৌম্বক শক্তির একটি বলয়। প্লাজমার আলোড়ণের ফলে এই চৌম্বক বলয়ের সৃষ্টি হয়। প্লাজমার তাপমাত্রা যত কমতে থাকে এই চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রাবল্য তত কমতে থাকে। আমাদের পৃথিবী যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন ছিল একটি প্লাজমার পিণ্ড। আস্তে আস্তে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

সূর্য একটি প্লাজমার পিণ্ড। সূর্যের প্লাজমা খুবই অশান্ত, তাই মাঝে মাঝে আঞ্চলিক চৌম্বক মেরুর সৃষ্টি হয় এবং প্লাজমার চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্যের জন্য দুটি কাছাকাছি মেরুর মধ্যে ফোয়ারার মত স্রোত সৃষ্টি করে এবং এক এক সময় ছিঁড়ে গিয়ে সূর্য কণার বিচ্ছুরণ করে অন্তরীক্ষে। চিত্রের ন্যায় পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্ট কবচ যা দক্ষিণ মেরু থেকে উত্তরমেরুর দিকে প্রবাহিত হয় তার বিকর্ষণে আমাদের বায়ুমণ্ডলে সূর্য কণা প্রবেশ করতে পারে না যা অন্তত প্রতি ৪ মিনিটে একবার প্রবাহিত হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে দক্ষিণ এবং উত্তর মেরুতে এই চৌম্বক ক্ষেত্র তুলনা মূলক পাতলা হওয়ায় মেরু অঞ্চলে সূর্যকণা প্রবেশ করে যার ফলে আমরা মেরুপ্রভা দেখতে পাই।

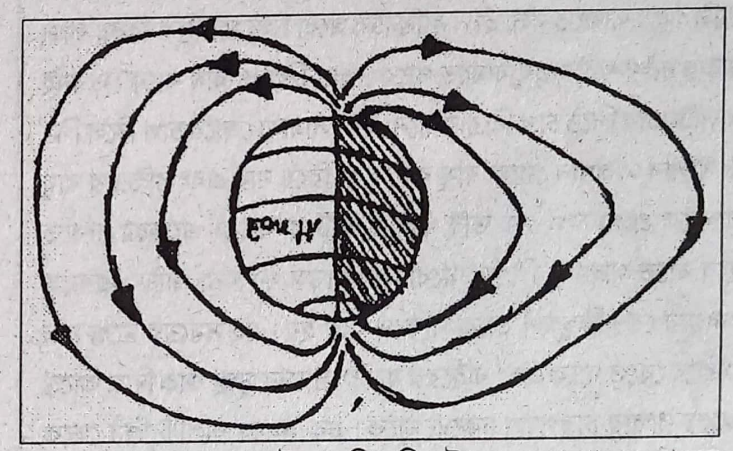

সুতরাং আমরা বুঝতেই পারছি যদি এই কবচ না থাকত তাহলে আমাদের অবস্থা হত মঙ্গলগ্রহের মতো। ইতিমধ্যে নাসায় এক বিজ্ঞানী চার বছর ধরে সুপার কম্পিউটারে একটি পোগ্রাম চালিয়ে তাতে এক অসাধারণ বিষয় লক্ষ্য করেছেন। প্রতি লক্ষ বছর অন্তর এই চৌম্বক বলরেখার মেরু স্থানান্তরিত হয় এবং সেই সময়ে পৃথিবীর চৌম্বক প্রাবল্য কমতে থাকে। এই বিস্ময়কারী তথ্য পাওয়ার পর বিভিন্ন পুরানো জমাট বাঁধা লাভার চৌম্বকমেরু পরীক্ষা করে দেখা গেল যে আজ থেকে ১,৭০,০০০ বছর আগে একবার বলরেখা দিক পরিবর্তন করেছিল। তার আগে ২,৬০,০০০ বছর আগে পরিবর্তন হয়েছিল। সুতরাং এই চৌম্বক শক্তি কমে যাওয়া কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। এই পরিবর্তন ১০০০ বছর ধরেও হতে পারে। ততদিনে আমরা এর প্রতিকারের উপায়ও বের করে ফেলতে পারব।

আমরা জানি ক্যানসার-এর সঙ্গে চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখন ক্যানসার রুগির সংখ্যা বৃদ্ধি প্রমাণ করে যে পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র প্রাবল্য দিনে দিনে কমছে। সুতরাং সেই দিন আর দেরী নেই যখন আমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের আকাশে দেখতে পাব মেরুপ্রভার মত আলো।

—সুদীপ কুমার দাস

কুকুর, সাপ, থালাপড়া

১ পাতার পর

রোগের ভাইরাস (র‍্যাবডো বা র‍্যাবিস্ ভাইরাস) থাকে সেসব ক্ষেত্রেই কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক হয় নতুবা হয় না। যদি কুকুরটির জলাতঙ্ক হয় তবে তার লালায় জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস থাকবে এবং কুকুরটি দশ দিনের মধ্যে মারা যাবে। এই ধরনের কুকুর কামড়ালে এবং অ্যান্টি র‍্যাবিস্ ভ্যাকসিন (ARV) না নিলে ব্যক্তিটি জলাতঙ্কে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বিড়াল-শিয়াল-নেকড়ে কামড়ালে অনুরূপ ঘটনা ঘটবে। বিষধর সাপের কামড়ের ক্ষেত্রে AVS (অ্যান্টি ভেনাম সিরাম) না নিলে বিষের প্রভাবে মানুষ মারা যাবে এইসব ক্ষেত্রে প্রয়োজন তাড়াতাড়ি চিকিৎসা।

কুকুরে কামড়ানো বা সাপে কাটা রোগীকে ওঝা বা গুণীনের কাছে নিয়ে গেলে ওঝা মন্ত্রপুত থালা পিঠে আটকে দেয়। ওঝা বলে ঐ থালা যতক্ষণ বিষ টানবে ততক্ষণ থালাটি পিঠে আটকে থাকবে, থালার বিষ টানা হয়ে গেলে থালাটি পড়ে যাবে। আসলে থালা বা কোনও ধাতু বিষ বা বিষের মতো কোন তরল পদার্থ শোষণ করতে পারে না। সুতরাং থালা পড়াতে বিষ নামানো যায় না। থালাটা লাগাবার পূর্বে আক্রান্ত ব্যাক্তিকে খালি গায়ে থাকতে বলা হয়। ব্যক্তিটির মধ্যে কিছু মানসিক বিষয় কাজ করার দরুণ শরীর খুব ঘামতে থাকে। তার পিঠেও ঘাম থাকে। তখনই থালাটা তার পিঠে চাপ দিয়ে বসানো হয়। সামান্য জোরে চাপ দিলে পিঠ ও থালার মাঝখান থেকে বায়ু বাইরে বেরিয়ে যায় এবং বাইরের বায়ু থালাকে প্রচণ্ড চাপ দেয় তাই থালাটি আটকে থাকে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে যাতে থালা ও পিঠের মধ্যে সামান্যতম ফাঁক না থাকে। এরকম অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ তাকে থাকতে বলা হয়। এই সময়ের মধ্যে ঘাম শুকিয়ে যেতে থাকে এবং বাইরের বাতাস ঘামের সূক্ষ্ম ফাঁক দিয়ে আস্তে আস্তে থালার চারপাশে ঢুকতে থাকে। এক সময়ে থালাটি পিঠ থেকে খসে পড়ে যায়। সুতরাং বুঝতে পারা যাচ্ছে এটা অতি সাধারণ ঘটনা। তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তি ভাল হয় কিভাবে? উত্তর খুব সোজা—কামড়ানো কুকুর, শিয়াল বা নেকড়ের লালায় নিশ্চয় জলাতঙ্ক রোগের ভাইরাস ছিল না বা সাপটি বিষধর ছিল না কিংবা সাপটি বিষধর হলেও মারণ মাত্রার বিষ ঢালতে পারেনি। সুতরাং এর থেকে পরিস্কার বলা যায় থালা পড়ার দ্বারা বিষ নামে না।

—শুভঙ্কর ঘোষ (বিজ্ঞানকর্মী),
ফোন : ২৫৮২-১১২৯

আবেদন

মরণোত্তর চক্ষুদান ও দেহ দানের অঙ্গীকার করুন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্বার্থে ও অন্ধ মানুষের দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিতে আপনার এই দান অমূল্য। ইচ্ছুক ব্যক্তিরা কাঁচরাপাড়া বিজ্ঞান দরবারের সাথে যোগাযোগ করুন।

জলাভূমি প্রকৃতির কিডনি, একে বাঁচান।

✆ ২৫৮৫-৬০৯৪
বিজলী
পেপার এন্ড ষ্টেশনার্স
কে.জি.আর.পথ, (লক্ষ্মী সিনেমার বিপরীতে) কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

(এই বিভাগে নিয়মিত ভাবে থাকবে লুপ্তপ্রায় প্রাণীদের কথা)

লাল পান্ডা : লাল পান্ডা বা ছোট পান্ডা এমন এক প্রাণী যাকে দেখলেই আদর করতে ইচ্ছে করে। এই প্রাণীটি হিমালয় অঞ্চল, নেপাল, সিকিম, মায়ানমার, দক্ষিণ চিনে দেখতে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল বাদামী লাল রঙের লোমে ঢাকা এই প্রাণীটি ডাঙায় খুব ধীরে চলাফেরা করলেও গাছে চড়তে পটু। আসলে এরা জীবনের অধিকাংশ সময় গাছে কাটায়। বেড়ালের মতো দেখতে এই প্রাণীটি ভালুক জাতীয় প্রাণী। এই প্রাণীটির বিজ্ঞানসম্মত নাম *Ailurus fulgens*। এই প্রাণীটিকে আকর্ষণীয় করেছে এর সুন্দর ফোলানো লেজ। মরচে লাল রঙের গাঢ় ও হালকা পটিতে সাজানো লেজটির ডগা কালো। এই প্রাণীটি বাঁশের নরম কান্ড, ফল, মূল, পোকামাকড়, পাখির ডিম, পাখি খেয়ে বেঁচে থাকে। সুযোগ পেলে এরা ছোটখাটো জীবজন্তুও ধরে খায়। অবস্থাভেদে এরা রুটি দুধও খায়। এরা বেড়ালের মতো চাপা শব্দ করে এবং ভালুকের মতো গর্জন করে। এরা ভালুকের মতো জলে নাক ডুবিয়ে জলপান করে। বেড়ালের মতো এরা নখ লুকিয়ে রাখে প্রয়োজনে বের করে। এই প্রাণীটিকে দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় গেলে দেখা যাবে।

লাল পান্ডা

অ্যাজ ডেড অ্যাজ ডোডো

বর্তমান সমাজে একটা কথা খুবই শোনা যায়, 'অ্যাজ ডেড অ্যাড ডোডো'। অর্থাৎ যে বিষয়ে কথা বলা হচ্ছে, তা অনেককাল আগেই শেষ হয়ে গেছে, যেমন ডোডো। অতঃপর প্রশ্নটা উঠতেই পারে যে ডোডো ঠিক কবে লুপ্ত হল বা হারিয়ে গেল। এই বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেকের মতে ডোডোকে শেষ দেখা গেছে ১৬৬২ সালে। অতি সম্প্রতি, অতলান্তিকের দুই তীরের দুই গবেষক একযোগে জানিয়েছেন যে, ১৬৬২ নয়, ডোডোর বিলুপ্তি তার অন্তত তিন দশক পরে হয়। তাঁদের সিদ্ধান্ত, ডোডো বেঁচে ছিল ১৬৯২ সাল অবধি।

প্রতি বছরই কোনও না কোনও প্রাণী এই পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিচ্ছে। ১৬০০ থেকে ১৮০০, এই দুই শতকের মধ্যে মানুষ অনেক পরিচিত পাখি চিরদিনের জন্য হারিয়েছে। আর ১৮০০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে লুপ্ত হয়েছে আটাত্তরটি প্রজাতির পাখি। ডোডোও পাখি বলেই স্বীকৃত। না বুঝেই মানুষ এই পাখিকে আখ্যা দিয়েছে 'আহাম্মক', 'নির্বোধ'। সমসাময়িক কালের মানুষ জানলেন না, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কী ইতিহাসই না তাঁরা লিখে গেলেন পরবর্তীকালের মানুষদের জন্য!

একজন ডাচ অ্যাডমিরাল ডোডোর নাম দিয়েছিলেন, 'ওয়ায় ডোগাল,' যার অর্থ কুৎসিত দর্শন বা কদাকার। পর্তুগিজরা এর নাম রেখেছিলেন 'ডাইডো', অর্থাৎ নির্বোধস্য নির্বোধ, হাবা। ইংরেজরা এর নাম দেন,

এরপর ৭ এর পাতায়

মহাবিশ্বে মহাকর্ষ

মহাবিশ্বের সমস্ত বস্তুই একে অপরকে আকর্ষণ করে। বস্তুর ভর বেশি হলে এই আকর্ষণ বল বেশি হয়। বস্তুর ভর কম হলে আকর্ষণ কম হবে। আবার দুটি বস্তু কাছাকাছি থাকলে এই আকর্ষণ বল বাড়ে ও দূরে সরে গেলে কমে যায়। এই আকর্ষণ বলের নাম মহাকর্ষ। মহাকর্ষ কোনও সাহিত্যিকের কল্পনাপ্রসূত নয়। বিজ্ঞানী নিউটনের সুগভীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও বিস্তৃত চিন্তাক্ষেত্রের ফসল।

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ কিভাবে যুগযুগ ধরে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে? কেন গ্রহরা সূর্যের ওপর এসে আছড়ে পড়ছে না? কেনই বা তারা মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাচ্ছে না? এইসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে নিউটনের মাথায় মহাকর্ষ বলের ভাবনা আসে। মহাকর্ষ বলের অস্তিত্বকে প্রথমেই বিজ্ঞানীরা মেনে নেননি। মহাকর্ষ বলের সাহায্যে মহাজাগতিক বিভিন্ন বস্তুর গতির ব্যাখ্যা পাওয়ার পর এই বল স্বীকৃতি লাভ করে। নিউটন তাঁর 'প্রিন্সিপিয়া' গ্রন্থে মহাকর্ষ বল ও তাঁর স্বীকার্যগুলি সম্বন্ধে লিখে রেখে যান। তবে এও উল্লেখ্য যে নিউটনের সমসাময়িক বিজ্ঞানী হাইগেন্‌সও মহাকর্ষ বলের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করেন।

মহাকর্ষ আবিষ্কারের পূর্বে বিজ্ঞানী কেপলার গ্রহদের গতি সম্বন্ধীয় তিনটি সূত্র দেন। এই সূত্রে তিনি বলেন গ্রহগুলো উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকার পথে সূর্যের চারপাশে ঘুরছে। কেপলারের সূত্র থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সূর্যের কাছে এলে গ্রহদের গতি বেড়ে যায়। আবার সূর্য থেকে দূরে চলে গেলে গ্রহদের গতি হ্রাস পায়। মহাকর্ষ সূত্রও কেপলারের সূত্রকে সমর্থন করে ও গ্রহদের গতির হ্রাস-বৃদ্ধির ব্যাখ্যা দেয়। আসলে গ্রহরা সূর্যের কাছে এলে সূর্য ও গ্রহদের মধ্যবর্তী মহাকর্ষ বলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় গ্রহদের গতিও বেড়ে যায়। গ্রহরা সূর্যের থেকে দূরে চলে গেলে এর বিপরীত ঘটনা ঘটে। বলা যেতে পারে গ্রহদের গতিসংক্রান্ত কেপলারের সূত্র ও মহাকর্ষ সূত্র পরস্পরকে সমর্থন করে। মহাকর্ষ উপগ্রহের গতি, ধূমকেতুর গতির ব্যাখ্যাও দিয়েছে। মহাকর্ষের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে নেপচুন আবিষ্কারের পর। সপ্তম গ্রহ ইউরেনাসের গতিতে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীদের মনে এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। মহাকর্ষ সূত্র অনুযায়ী ইউরেনাসের ওপরে কোনও মহাজাগতিক বস্তুর মহাকর্ষ বলের প্রভাবই ইউরেনাসের অদ্ভুত গতির কারণ। ১৮৪৫ সালে জন অ্যাডামস মহাকর্ষ সূত্রের ওপর ভিত্তি করেই ইউরেনাসের বাইরে একটি গ্রহের সন্ধান পান। ১৮৪৬ সালে বিজ্ঞানী লেভেরিয়ের নতুন গ্রহের অবস্থান নির্দেশ করেন। নাম হয় নেপচুন। এছাড়া নক্ষত্রের জন্ম, বিবর্তন, মৃত্যুকে ব্যাখ্যা করল মহাকর্ষ।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্য উন্মোচনের চাবিকাঠি হল মহাকর্ষ। তবে মহাকর্ষ ব্যর্থ হয়েছিল বুধ গ্রহের গতি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। এই গ্রহের অনুসূর বিন্দুর অবস্থান পরিবর্তন ঘটে। এক শতাব্দীতে এই পরিবর্তনের মান ৫৩ সেকেন্ড। ইউরেনাসের মতনই এবারও বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন বুধেরও আগে নিশ্চই কোনও গ্রহ আছে। তারই মহাকর্ষ বলের প্রভাবই বুধের এরূপ আচরণের কারণ। কিন্তু বহু পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেও বুধ ও সূর্যের মাঝে কোনও গ্রহের সন্ধান মিলল না। মহাকর্ষ বুধ গ্রহের গতির কোনও ব্যাখ্যা দিতে অসমর্থ হল। বিংশ শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইনের 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ' থেকে এই ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। আবিষ্কারের পর থেকে মহাকর্ষ দুইশত বছর একাধিপত্য করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই মহাকর্ষের নতুন ব্যাখ্যা করতে সুরু করেন তৎকালীন বিজ্ঞানীরা। আইনস্টাইন তাঁর 'সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ'-এ মহাকর্ষের এক নতুন রূপ ও মাত্রা দিলেন। মহাকর্ষের স্বরূপকে তিনি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরলেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গূঢ় রহস্যের নতুন করে উন্মোচন ঘটল আইনস্টাইনের মহাকর্ষ ব্যাখ্যায়।

পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য ও ভারতীয় বিজ্ঞানীরা মহাকর্ষকে অবলম্বন করে মহাবিশ্বের বিভিন্ন বস্তুর বৈচিত্র্যের কারণ ব্যাখ্যায় সমর্থ হন। স্বাভাবিক ক্ষেত্রে মহাকর্ষ সম্পর্কে আইনস্টাইনের ব্যাখ্যার রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। নিউটন মহাকর্ষকে 'বল' বলেছেন। কিন্তু আইনস্টাইন মহাকর্ষ ক্ষেত্র'র ধারণা দিয়েছেন। নিউটন মহাকর্ষ সূত্রে বলেন বস্তুর ভর অপরিবর্তনীয়। এর নাম মহাকর্ষীয় ভর। কিন্তু আইনস্টাইন গাণিতিক বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে ভরেরও পরিবর্তন ঘটে। বস্তুর গতিবেগ বৃদ্ধির সাথে সাথে ভরেরও বৃদ্ধি ঘটে। কোনও বস্তু যদি আলোর গতিবেগে (সেকেন্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল) চলে তাহলে তার ভর হবে অসীম। বস্তুর বেগ বৃদ্ধির সঙ্গে ক্রমবর্ধমান ভরের নাম আপেক্ষিক ভর (Relativistic mass)। আইনস্টাইন বলেন, কোনও ভারী বস্তুর মহাকর্ষ ক্ষেত্রের মধ্যে কোনও গতিশীল বস্তুর গতিপথ বেঁকে যায়। এমনকি আলোর গতিপথও বেঁকে যায়।

মহাজাগতিক সমস্ত বস্তুর গতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ও বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনার পরিচয় দেয় চারটি বল। এগুলোর মধ্যে মহাকর্ষ বল অন্যতম। যদিও এই বল খুবই ক্ষীণ। দুটি বিশেষ ধর্মের জন্য এই বলের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়— (১) বহু দূরত্বেও এই বল ক্রিয়া করে, (২) এই বল সবসময়ই আকর্ষণ করে। তবে আধুনিক পদার্থবিদ্যায় বলা হচ্ছে, মহাকর্ষ বল কনারূপে চলে। ভরবিহীন এই কণার নাম 'গ্র্যাভিটন'। ভরহীন হওয়ায় এই কণা অত্যন্ত দ্রুত ও বহুদূর পর্যন্ত চলাচল করতে পারে। যদিও এখনও পর্যন্ত এই কণার বাস্তব অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়নি। তবে মহাকর্ষ সতত ক্রিয়াশীল। সে নিউটনের মহাকর্ষই হোক আর আইনস্টাইনের মহাকর্ষই হোক।

—কাকলি সরকার

অ্যাজ ডোডো

৬ পাতার পর

'ডোডার'। ডোডার পরিণত হয় 'ডু-ডু'-তে, অবশেষে স্থির হল 'ডোডো'-তে।

ডোডোর বসবাস ছিল ম্যারকারনেসের তিন দ্বীপের অন্যতম জনমানবহীন মরিশাসে। আবলুশ গাছের বনে আছে কিছু পায়রা আর টিয়া। আর ডাঙায় এই ডোডো আর কচ্ছপ। প্রথম অভিযাত্রী পর্তুগীজরা এই দ্বীপে আসেন ১৫০৭ সালে। ডোডো তাঁদের চোখে পড়েনি। ১৫৯৮ সালের দ্বিতীয় অভিযানের পৃষ্ঠপোষক প্রিন্স মরিস অব নাসুর নামেই দ্বীপের নামকরণ হয়। ৩ ফুট উচ্চতার প্রায় ২৫ পাউন্ড ওজনের ডোডো এই সময় প্রথম মানুষের চোখে পড়ে। হঠাৎ দেখলে টার্কি বা রাজহাঁস মনে হয়, পায়ের সঙ্গে হাঁসের কিছুটা মিল, ঠোঁটটা কাকাতুয়ার মত। সবচেয়ে বড় কথা, প্রাণ রক্ষার কোনও দায় না থাকায় পাখিটা উড়তে পারে না, দৌড়াতেও পারে না। কোনও রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে। তার প্রজনন ক্ষমতাও খুবই কম। ডাচরা মরিশাসে বসবাস শুরু করে। তাদের সঙ্গে আসা কুকুর, বিড়াল, শুকরেরা ডোডোর ডিমেই মহাভোজ চালায়, আর তার নরম মাংস মেটায় মানুষের রাক্ষুসে ক্ষুধা। এইভাবে ডোডো হারিয়ে গেল পৃথিবী থেকে। আর ইংরেজি ভাষায় এলো এক নতুন শব্দবন্ধ 'অ্যাজ ডেড অ্যাজ ডোডো'।

—পিংকি চক্রবর্তী, নবম শ্রেণী,
কাঁচরাপাড়া ইন্ডিয়ান গার্লস হাই স্কুল।

প্রশ্নোত্তর

বিষয় : ডাইনি প্রথা

১৬.২.০৪ কাঁচরাপাড়া নজরুল ইসলাম মঞ্চে এক বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসার কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চলের ৪২টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করেছিল। ডাইনি প্রথা বিষয়ে ৬ টি প্রশ্নের নবম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দেওয়া সেরা উত্তর ছাপান হল (সামান্য সংশোধন সহ)। — সম্পাদক, বিজ্ঞান অন্বেষক।

প্রশ্ন : ডাইনি হিসাবে সাধারণত কাদের চিহ্নিত করা হয় ?

উঃ (১) সাধারণত গ্রামের অধিবাসীদের, যাঁরা নিরক্ষরতা, দারিদ্রের বেড়াজালে বন্দী, নিরীহ বিধবা, বয়স্কা ও অসহায় মহিলাদের ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

বৈশাখী দাস ও ঝুমা কুণ্ডু
বারুইপাড়া হাইস্কুল।

উঃ (২) সাধারণত প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিধবা অসহায় মহিলাদের ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। গ্রামের কোনও ধনী মানুষ বা স্বার্থপরায়ণ ব্যক্তি তাদের স্বার্থকে পূরণ করার জন্য এই সমস্ত দরিদ্র সহায়-সম্বলহীন মহিলাদের ডাইনি অপবাদ দেয়।

অমৃতা গাঙ্গুলী ও লিজা চাকী রায়
হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ।

প্রশ্ন : কোনও মানুষকে কিভাবে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ?

উঃ (১) যেসব অঞ্চলের মানুষ কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ এবং যেখানে স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই বললেই চলে সেইসব অঞ্চলের মানুষ রোগ হলে চিকিৎসার জন্য ওঝার বা গুণীনের কাছে যায়। ওঝারা যখন জড়িবুটি দিয়ে রোগীকে সুস্থ করতে পারে না তখন নিজের প্রাধান্য বজায় রাখতে বিভিন্ন মহিলাদের বিশেষকরে বৃদ্ধা, বিধবা অসহায় মহিলাদের ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে।

শুভ্রা পোদ্দার, উত্তম ঘোষ
নগরউখরা উচ্চ বিদ্যালয়।

উঃ (২) নিরক্ষরতা ও দারিদ্র কবলিত গ্রামে যেখানে পড়াশোনার আলো পৌঁছায়নি, সেইসব গ্রামে অসুখ বিসুখের প্রকোপ বাড়লে, হাসপাতাল বা ডাক্তারের কাছে না গিয়ে মানুষ যায় ওঝা, গুণীনের কাছে। ওঝা গুণীনরা চালায় জড়িবুটির টোটকা চিকিৎসা। চিকিৎসাতে রোগ না সারলে ওঝা বা গুণীন ডাইনি সন্দেহের গল্প শুরু করে। তারপরে সখা বা জানগুরুর গণনায় সন্দেহের ব্যক্তি ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত হয়।

প্রীতিলতা বিশ্বাস ও সম্পিতা দাস
বিধানচন্দ্র মেমোরিয়াল গার্লস গভঃ হাই স্কুল।

প্র : ডাইনি প্রথা সমাজের পক্ষে ভালো না খারাপ ?

উঃ ডাইনি প্রথা সমাজের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। কাউকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে অত্যাচার চালালে তার প্রভাব দেখা যায় ঐ অঞ্চলের শিশুদের ওপর। তাদের মানসিক জগতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অনেক মানুষ অত্যাচারের দৃশ্য দেখে অসুস্থবোধ করেন। সব থেকে বেশি ক্ষতি হয় ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত মানুষটির। এই সুন্দর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকার তার থাকে না। তারা কোনওরকম অপকর্ম বা অপরাধ না করেই এই শাস্তি পায়।

অমৃতা গাঙ্গুলী এবং
লিজা চাকী রায়
হালিশহর রামপ্রসাদ বিদ্যাপীঠ।

প্র : আদিবাসীদের মধ্যে ডাইনি প্রথা বেশি কেন ?

উঃ আদিবাসীদের মধ্যে ডাইনি প্রথা বেশি থাকার কারণ হল এরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গরীব, নিরক্ষর প্রত্যন্ত গ্রামবাসী। গ্রাম থেকে চিকিৎসার জন্য শহরের হাসপাতালে বা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া ব্যয়সাপেক্ষ। তাদের অনেকের মনে এখনো ধারণা আছে, শহরের মানুষ তাদের ভালভাবে গ্রহণ করবে না। তাছাড়া বিভিন্ন ব্যক্তি আদিবাসী সমাজে কুসংস্কারগুলো জীইয়ে রাখে তাদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

কাকলি সরকার এবং দীপশিখা বসাক
মদনপুর কে এ ভি ফর গার্লস।

প্র : ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তুমি কি ভূমিকা নিতে পার ?

উঃ (১) সাধারণত ছাত্র-ছাত্রীদের ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে কিছু করণীয় নেই। তা সত্ত্বেও আমরা আমাদের মতামত জানাতে পারি। যারা এই প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন তাদের সমর্থন করতে পারি। মানুষকে বোঝাতে পারি তারা যেন যুক্তিবাদী হয়। তাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারি।

সংযুক্তা সরকার এবং জেসমিন বল
রাজলক্ষ্মী কন্যা বিদ্যাপীঠ।

উঃ (২) ডাইনি প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আমি আমার গ্রামবাসীদের বোঝাতে পারি। বিদ্যালয়ের ছুটির দিনে আমি বন্ধুদের সাথে নিয়ে বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে ডাইনি প্রথা যে কুপ্রথা তা বোঝাতে পারি।

স্বস্তিকা কালিয়া
পলাশী আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়।

প্র : এই কুপ্রথা কিভাবে বন্ধ করা যেতে পারে ?

উঃ (১) এই কুপ্রথা বন্ধ করতে হলে যারা এইসব বিশ্বাস করে তাদের কুসংস্কার মুক্ত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার সুব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

সৌমেন বারুই, সুরজিৎ দে
কাঁচরাপাড়া মিউনিসিপ্যাল পলিটেকনিক হাইস্কুল।

উঃ (২) এই কুপ্রথা বন্ধ করার জন্য চেতনা জাগাতে হবে। মানুষের মনকে সহজ সরল করতে হবে। আমাদের উচিত সমাজের দিকে নজর দিয়ে মানুষকে বোঝান। আর এটা করতে হবে বৈজ্ঞানিক যুক্তির মাধ্যমে।

দেবাশিষ মণ্ডল
কাঁপা উচ্চ বিদ্যালয়।

বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকাটির সর্বস্বত্ত্ব বিজ্ঞান দরবার সংস্থা কর্তৃক সংরক্ষিত। সম্পাদক মণ্ডলী— প্রতুলকুমার দাস, দীপক মজুমদার, বিজয় সরকার, সুরজিৎ দাস ও সুজয় বিশ্বাস (বিজ্ঞান দরবারের পক্ষে)। ফোন - ২৫৮৫ ৬০৩২, ২৮৭৬ ০৭২০, ২৫৮৮ ০৮২১, ২৫৮৭ ৬২৭৫

স্বত্ত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদ নগর) পোঃ কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা- উত্তর২৪পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পোঃ কাঁচরাপাড়া, জেলা- উত্তর ২৪পরগণা, পিন-৭৪৩১৪৫ থেকে মুদ্রিত।
সম্পাদক– শিবপ্রসাদ সরদার।

E.mail- ganabijnan@yahoo.co.in.